রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ল্যান্ড মার্ক অতিক্রম

এম এ খালেক

করোনা অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট নানা সঙ্কট সত্বেও বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ঊর্ধ্বমুখি প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (২০২১-২০২২) বাংলাদেশের রপ্তানি আয় প্রথমবারের মতো পঞ্চাশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ল্যান্ড মার্ক অতিক্রম করেছে। জুলাই-জুন,২০২২ সময়ে বাংলাদেশ পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে মোট ৫২দশমিক ০৮ বিলিয়ন (৫ হাজার ২০৮ কোটি) মার্কিন ডলার আয় করেছে। আগের অর্থবছরের তুলনায় রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩৫ দশমিক ১৪শতাংশ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি করে মোট আয় করেছিল ৩ হাজার ৮৭৬ কোটি মার্কিন ডলার। করোনার কারণে গত অর্থবছরে রপ্তানি আয় কিছুটা কমে গিয়েছিল। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছিল ৪ হাজার ৫৪ কোটি মার্কিন ডলার। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে বাংলাদেশ যে রপ্তানি আয় করেছে তা ইতিপূর্বেকার রপ্তানি আয়ের ধারাবাহিক সাফল্যকে অতিক্রম করে গেছে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি আয় একযোগে ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। বরাবরের মতোই বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক খাত তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এই খাতে আয় হয়েছে ৪ হাজার ২৬১ কোটি মার্কিন ডলার। তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয়ের এই সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সংস্থাটি ২০৩০ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) মার্কিন ডলার। অর্থাৎ আগামী নয় বছরের মধ্যে ৫ হাজর ৭৮৪ কোটি মার্কিন ডলার অতিরিক্ত আয় করা হবে তৈরি পোশাক খাত থেকে।

পণ্য রপ্তানি আয়ের এই অভূতপূর্ব সাফল্য সামগ্রিক অর্থনীতির সচলতারই পরিচয় বহন করে। করোনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বাভাবিক গতিতেই পরিচালিত হচ্ছে। রপ্তানি আয়ের একটি সাফল্য অনেকের নিকটই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন হলো, বিশ্বব্যাপী যেখানে অর্থনৈতিক মন্দার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ কীভাবে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এই সাফল্য অর্জন করেছে? বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের এই সাফল্যের পেছনে অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে রপ্তানি পণ্য তালিকার বহুমুখিকরণের প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি বড়ো প্রতিবন্ধকতা বা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে সীমিত সংখ্যক পণ্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। এবং যেসব পণ্য রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে রয়েছে তাদের বেশির ভাগই আমদানিকৃত কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজ নির্ভর। ফলে এসব পণ্য রপ্তানি করে যে আয় হয় তার একটি বড়ো অংশই কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি বাবদ দেশের বাইরে চলে যায়। এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য সরকার রপ্তানি পণ্য তালিকা বহুমুখিকরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর পণ্যগুলোর রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্য প্রায় শতভাগ স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর। ফলে এসব পণ্য থেকে যে অর্থ আয় হয় তার প্রায় পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। আগামীতে সম্ভাবনাময় অথচ স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর অপ্রচলিত পণ্য বেশি করে রপ্তানি পণ্য তালিকায় স্থান দেবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

করোনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি ব্যাপক মাত্রায় ঊর্ধ্বমুখি প্রবণতায় রয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালি অর্থনীতিও ৯ দশমিক ১ শতাংশ মূল্যস্ফীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। বিগত ৪০ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এত উচ্চমাত্রায় মূল্যস্ফীতির আর কখনোই সৃষ্টি হয়নি। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ আশঙ্কাজনকভাবে কমতে শুরু করেছে। এটা হচ্ছে মূলত উচ্চ মাত্রার মূল্যস্ফীতির কারণে। কয়েকদিন আগে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্বল্পতার কারণে অন্তত ১৭টি দেশ মারাত্মক সঙ্কটে পতিত হয়েছে। এসব দেশ যে কোনো মুহূর্তে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশকে এই তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কিছু কম। এই পরিমাণ রিজার্ভ দিয়ে দেশের পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। একটি দেশের তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ থাকলেই তাকে স্বস্তিদায়ক বলে মনে করা হয়। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কমে যাবার কারণে দেশগুলো তাদের আমদানি ব্যয় সংকুচিত করতে বাধ্য হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সব ধরনের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফলে জনগণের ভোগ প্রবণতা এবং ভোগ ব্যয়ের সামর্থ্য সাংঘাতিকভাবে কমে গেছে। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের উপস্থিতি কমাতে বাধ্য হচ্ছেন। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হ্রাসের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে দেশগুলো বাইরে থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি সাংঘাতিকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভোক্তাদের এই আচরণ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য 'শাপে বর' হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড়ো অংশ জুড়ে আছে তৈরি পোশাক। আন্তর্জাতিক বাজারে ভোক্তাগণ এখন উন্নতমানের উচ্চ মূল্যের তৈরি পোশাক ক্রয় কমিয়ে

দিয়েছেন। তারা বাধ্য হচ্ছেন তুলনামূলক কম মূল্যের তৈরি পোশাক ক্রয় করে তাদের চাহিদা মেটাতে। ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল ২০০৭-২০০৮ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে সৃষ্ট মন্দার কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য তেমন এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কারণ বাংলাদেশ তুলনামূলক কম মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এবারও ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে সেই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সরকার রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে সীমিত সংখ্যক দেশের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। বাংলাদেশ অন্তত ১৭৫টি দেশে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে মোট রপ্তানির প্রায় ৮৫ শতাংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা(জেনারালাইডজ সিস্টেম অব প্রেফারেন্স) দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের কোনো শুল্ক প্রদান করতে হয় না। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকগণ ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিপুল পরিমাণে পণ্য রপ্তানি করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ যে বিপুল পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে তার প্রায় ৫৫ শতাংশই যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তীর্ণ হবে। এটা হবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো অর্জন।

কিন্তু বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার পর আরো তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে জিএসপি সুবিধা পাবে। তারপর বাংলাদেশের পণ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে প্রবেশ করতে হলে নির্ধারিত হারে শুল্ক দিতে হবে। বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা আরো প্রায় এক দশক বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে নতুন নতুন রপ্তানি গন্তব্য অনুসন্ধান করছে। বেশ কিছু নতুন দেশ ও অঞ্চলে বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি শুরু করেছে। এমন কি রাশিয়া এবং ইউক্রেনে বাংলাদেশ বর্ধিত হারে পণ্য রপ্তানি শুরু করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের কারণে তা বর্তমানে কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বাংলাদেশ জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভারত ইত্যাদি দেশে বর্ধিত হারে পণ্য রপ্তানির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'লুক ইস্ট' নীতির আওতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো জোরদার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। রপ্তানি ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করে বাংলাদেশ আগামীতে তার রপ্তানি সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা ১২ থেকে ২৬টিতে উন্নীত করেছে। এছাড়া ১২৩টি পণ্যের আমদানি শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। ফলে আগামীতে অভ্যন্তরীণ এসব পণ্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা জোরদার হবে। অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের প্রতি মনোনিবেশ করা হলে উৎপাদন নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাবে। আর উৎপাদিন বৃদ্ধি পেলে সেই পণ্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে।

দেশের বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলে দেশের পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লব সূচিত হবে। গত ২৫ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্নের পদ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। এতে রাজধানীর সঙ্গে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ২১টি জেলার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আগামীতে এই জেলাগুলোতে উৎপাদিত পণ্য আমাদের রপ্তানি পণ্য তালিকাকে আরো সমৃদ্ধ করবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড়ো পূর্বশর্ত। বাংলাদেশে বর্তমানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করায় উৎপাদকগণ নিশ্চিতভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেন। আগামীতে আমাদের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সেই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আমাদের এখনই কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে তাদের নিকট থেকে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

লেখক- অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক